স্মৃতিমালা

যা শুনেছি, যা দেখেছি, যা পেয়েছি

স্বামী বিমলাত্মানন্দ

পরমপূজনীয়
সহ সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজ,
রামকৃষ্ণ মঠ ও
রামকৃষ্ণ মিশন

শ্রীশ্রীমায়ের সঙ্গে কিশোরী মহারাজের একটি ঘরোয়া সংলাপ বলে ইতি টানব। ঘরোয়া হলেও মায়ের কথাগুলি অন্তরে বিঁধে যায়। জয়রামবাটীতে একদিন কিশোরী মহারাজ মায়ের সঙ্গে কুটনো কুটতে কুটতে মাকে বলছেন, ''মা, স্বামীজী বলছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান না হলে মুক্তি নেই। আমাদের কী হবে?'' মা শুনে গম্ভীর হয়ে বললেন, ''ও পথ কঠিন পথ। আমার কাজ করছ, যা করছ—এতেই সব হবে।'' কিশোরী মহারাজ বুঝলেন মায়ের আশ্বাসবাণী। তাই বোধহয় তিনি জয়রামবাটীতে মায়ের কাজে সারাজীবন নীরবে কাটিয়ে দিলেন।

স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর কথা উল্লেখ করেছি। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তিনি রামময় মহারাজ নামে সুপরিচিত। পূর্বাশ্রমের নাম রামচন্দ্র কিন্তু শ্রীশ্রীমা নাম রাখলেন রামময়। তাই তিনি মায়ের রামময় মহারাজ। আমি যখন তাঁকে দেখি, তখন তাঁর বয়স প্রায় পঞ্চাশ। তিনি সেসময়ে জয়রামবাটী মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ। ছোটখাটো মানুষ। গায়ের রং ফর্সা। সদা হাসি মুখ। দেখে মনে হল যেন সরল শিশু। তখন শুধু জেনেছিলাম তিনি শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান ও সেবক। পরে তাঁকে দেখি বেলুড় মঠে, তখনও তিনি মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ। তারপর থেকে বেশিরভাগ সময়ই বেলুড় মঠে দেখি। নয়-দশ বছর আগের দেখার ছবির বিশেষ পরিবর্তন হয়নি—তবে বয়সের ছাপ পড়েছে। পোশাকের দিকে নজর বেশি নেই। হাঁটুর নিচে

কাপড়। মাথায় কখনও থাকত মিশন-টুপি। আমি তখন বেলুড় মঠে ট্রেনিং সেন্টারে। সেখানেই তাঁর মুখে মায়ের স্মৃতিকথা শুনি। ছোট ছোট বাক্যে ইংরেজিতে গল্পের মতো করে মায়ের কথা বললেন যা আমরা এখন ছাপার অক্ষরে পাই। কিন্তু মা-ময় হয়ে এমনভাবে বললেন যে, আজও তাঁর বলার ছবি চোখের সামনে ভাসে। রামময় মহারাজের দেওয়া মায়ের অন্তরঙ্গ ও অন্দরমহলের বর্ণনা আমাদের মনকে জয়রামবাটীতে নিয়ে যায়। একেবারে ঘরোয়া পরিবেশ সৃষ্টি করে তাঁর স্মৃতিকথা।

শুনেছি—মায়ের নিত্যদর্শন না করলে তাঁর শান্তি হত না। মায়ের কথা বলতে আরম্ভ করলে তাঁর চোখমুখ একেবারে বদলে যেত। ১৯২২ সালে জয়রামবাটীতে রামময় মহারাজ যোগদান করেন। পরের বছর মায়ের মন্দির প্রতিষ্ঠা উৎসবে প্রাণপণ খেটেছিলেন। জয়রামবাটীতে প্রথম ছয় বছর এবং জীবনের শেষ কুড়ি বছর মাতৃধ্যানে কাটিয়েছিলেন। তাঁর ব্যবহার সরল ও মধুর। কঠোর সাধুজীবন ছিল তাঁর। প্রায় তিনবছর আলমোড়ায় তপস্যা করেছিলেন। জপধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। শোনা যায়, তিনি প্রতিদিন চুয়ান্ন হাজার জপ করতেন এই সময় (১৯৪৯-১৯৫২)।

তপস্যা ভঙ্গ হল—কিন্তু শরীর ভেঙে গেল। বিশ্রাম নিলেন কিছুকাল, আবার স্বাস্থ্য ফিরে পেলেন। এবার লক্ষ্ণৌ সেবাশ্রম। সেখানে চোদ্দো বছর অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন সেবাশ্রম ছিল শহরের মধ্যে ঘিঞ্জি এলাকায়। কিন্তু তাঁর নেতৃত্বে সেবাশ্রমের প্রভূত উন্নতি হয়। ভক্তেরা তাঁর সরল ও অমায়িক ব্যবহারে মুগ্ধ হতেন।

রামময় মহারাজের ব্রহ্মচর্য হয় স্বামী সারদানন্দজীর কাছে ১৯২৪ সালে। নাম হয় গোপালচৈতন্য। এর চার বছর পরে ১৯২৮ সালে সন্ন্যাস। নাম হয় স্বামী গৌরীশ্বরানন্দ। তাঁর সন্ন্যাস সতীর্থদের মধ্যে ছিলেন স্বামী গম্ভীরানন্দজী, স্বামী ভূতেশানন্দজী ও স্বামী শিবস্বরূপানন্দজী (মতি মহারাজ, মহাপুরুষ মহারাজের সেবক)। রামময় মহারাজের সন্ন্যাস নাম সার্থক—তিনি ছিলেন সদাশিব। আশ্রমের মধ্যে ফতুয়া গায়ে দিয়েই চালিয়ে নিতেন। জয়রামবাটী ছাড়া দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠে (চোদ্দো বছর), মুম্বই রামকৃষ্ণ মঠে (তিন বছর) তিনি কর্মী ছিলেন। কিছুকাল মহীশূর আশ্রমেও ছিলেন । তাঁর শেষ জীবন কাটে মাতৃপদচ্ছায়ায় মাতৃসেবা ও ধ্যানে। বারো বছর মাতৃমন্দিরের অধ্যক্ষ (১৯৬৬-১৯৭৮) ও জীবনের শেষ আট বছর (১৯৭৮-১৯৮৬) জয়রামবাটীতে মাতৃসুধা ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করে শ্রীশ্রীমায়ের শ্রীচরণে মিলিত হন ২২ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬। পরদিন প্রতিটি সংবাদপত্রে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর দেহাবসান সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল।

পুরনো সাধুদের কাছে শুনেছি দেওঘরে ছাত্রদের কাছে রামময় মহারাজের অসম্ভব জনপ্রিয়তার কথা, ঘুমকাতরতার কথা। তিনি ছাত্রদের সঙ্গে হাসিঠাট্টা করতেন। অত্যন্ত মিষ্টভাষী ছিলেন। সেই সুবাদে ছাত্রদের কাছে তিনি ছিলেন রামময়দা। কোনও খিটখিটে স্বভাবের সাধুর কাছে এক ছাত্র তাঁদের রামময়দার খবর জানতে চাইলে ওই সাধু বেশ ব্যঙ্গের স্বরে বললেন, ''অ্যাঁ! রাম-ময়দা! আর আমরা যেন অর্ডিনারি ময়দা!''

নিদ্রাদেবী রামময় মহারাজের খুবই সহায় ছিলেন। বই পড়লে ঘুমিয়ে পড়তেন, পাঠ শুনতে শুনতে অচিরেই ঘুমে ঢলে পড়তেন। বালিশে মাথা দিলেই ঘুমে চোখ জুড়িয়ে আসত। শেষ বয়সে

।৮৩।

তাঁর ঘুম আসত আরও পাঁচ মিনিট পরে। তাঁর জীবনে এইটি ছিল একমাত্র অসুবিধা—সেকথা তিনি দশম সঙ্ঘাধ্যক্ষ মহারাজকে বলেছিলেন। জয়রামবাটীতে ডাকাতি হয়েছে। ঘর ছেড়ে তিনি ধানখেতে পালিয়ে গেলেন—আর ওখানেই ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্ত মনে। তিনি বিছানায় শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে পড়তেন ঠিক, কিন্তু মধ্যরাতে বিছানায় বসে বাকি রাত ধ্যানে মগ্ন থাকতেন। তিনি ছিলেন জাপক। শ্রীশ্রীমা বলতেন, 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'। রামময় মহারাজ ছিলেন 'জপাৎ সিদ্ধিঃ'র মূর্ত প্রতীক। সরল হলে ভগবানকে সহজে পাওয়া যায়। মায়ের উপর একান্ত শরণাগত হলে আর কোনও ভাবনা নেই—তাঁর জীবনটি ছিল ওই মাতৃ-শরণাগতির পূর্ণরূপ। সঙ্ঘে স্বামী গৌরীশ্বরানন্দজীর এইটি সবচেয়ে বড় অবদান।

রামময় মহারাজ সম্বন্ধে অনেক ঘটনা আছে। তিনি বত্রিশবার চিবিয়ে তবে খাবার খেতেন। তাঁর ধারণা ছিল এমন না করলে হজম হয় না। খাওয়ার পর পান চিবুতেন—তখন তাঁকে একটি বাচ্চা ছেলে মনে হত। আমরা দেখে হাসতুম, আনন্দ পেতুম তাঁর এই অদ্ভুত সরলতার জন্য।

রামময় মহারাজের জন্মগত প্রতিভা ছিল ফুল চর্চার। তিনি ফুল বিশারদ। বিশেষত গোলাপ বিশেষজ্ঞরূপে সারা ভারতে গোলাপপ্রেমিকদের কাছে সুপরিচিত ছিলেন রামময় মহারাজ। দিল্লিতে সবচেয়ে বড় গোলাপ প্রদর্শনী প্রতিযোগিতার আয়োজন হত, এখনও হয়। শ্রেষ্ঠ গোলাপ নির্বাচনে রামময় মহারাজ প্রধান বিচারক হতেন। তাঁর সঙ্গে অন্য যাঁরা বিচারক হতেন, তাঁরা একবাক্যে মহারাজের মতামতকে প্রাধান্য দিতেন। প্রয়াত ইন্দিরা গান্ধী যতদিন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, গোলাপ প্রদর্শনীতে আসতেন। ব্যক্তিগতভাবে রামময় মহারাজের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। প্রদর্শনীতে বিভিন্ন পুরস্কার দেওয়া হত। পুরস্কার দেওয়ার পর ইন্দিরা গান্ধী রামময় মহারাজ সহ অন্যদের চা-চক্রে আমন্ত্রণ করতেন। ইন্দিরা গান্ধী মহারাজকে 'Rose Swami' নামে ডাকতেন। সেই থেকে বিভিন্ন Rose Society বা Rose Garden-এর সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিদের কাছে রামময় মহারাজ 'Rose Swami'। ইন্দিরা গান্ধী রামময় মহারাজের রসগোল্লা-প্রীতির কথা জানতেন। মহারাজ ডায়াবেটিক জানা সত্ত্বেও তিনি তাঁর জন্য রসগোল্লার ব্যবস্থা করতেন। আর মহারাজও অম্লানবদনে অত্যন্ত খুশিমনে সেগুলির সদ্ব্যবহার করতেন। শুধু দিল্লিতে নয়, ভারতে যেখানেই গোলাপ প্রদর্শনী হত, রামময় মহারাজের ডাক পড়ত বিচারক হওয়ার জন্য। সুবিধা হলে তিনি আয়োজকদের ডাকে সাড়া দিতেন।

জয়রামবাটীতে শ্রীশ্রীমায়ের পূজার জন্য ফুলচাষ আরম্ভ করেছিলেন রামময় মহারাজ। মা স্নেহের সন্তানের গুণগ্রাহী ছিলেন। ফুল ফুটলে রামময় মহারাজকে দেখিয়ে তবেই মা ফুল তুলে পূজা করতেন। এমনকী তাঁর যেতে কয়েকদিন দেরি হলেও মা তাঁর জন্য অপেক্ষা করতেন।

রামময় মহারাজ মেদিনীপুর জেলার জগন্নাথপুর গ্রামের সাধারণ বাড়ির ছেলে। তিনি চূড়ামণি দে ও শশীমুখী দেবীর দ্বিতীয় সন্তান। তাঁদের কুলদেবতা ছিলেন শ্রীনারায়ণ আর কুলদেবী ভৈরবী। বাবা-মার ধর্মপ্রাণতা রামময় মহারাজের উপর বর্তেছিল। প্রথমে গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষা ও পরে বদনগঞ্জ উচ্চ বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করেন। তিনি ছিলেন মেধাবী, বুদ্ধিমান, নম্র, শান্ত। বাড়ি থেকে বদনগঞ্জের দূরত্ব আট মাইল। এই দীর্ঘপথ অতিক্রম করে স্কুলে যেতেন। শিক্ষক ও ছাত্রদের

।৮৪।

অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন তিনি। বদনগঞ্জ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়—শ্রীশ্রীমায়ের দীক্ষিত সন্তান—তাঁর এই প্রিয় ছাত্রটিকে জয়রামবাটীতে মায়ের শ্রীচরণপ্রান্তে এনেছিলেন। মা-ও এই শুদ্ধাত্মা ছেলেটিকে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হয়ে নিজের সেবায় লাগিয়ে তাঁকে মনের মতো করে গড়েছিলেন। তিনি তাঁকে ছেলে মনে করতেন না, বলতেন 'আমার মেয়ে', বিশেষত মেয়েভক্তদের কাছে। রামময় মহারাজ মায়ের দুর্লভ সেবা ও পূতসঙ্গ পেয়েছিলেন ছাত্রাবস্থা থেকেই। প্রতি শনিবার এসে মায়ের কাছে কাটিয়ে সোমবার চলে যেতেন স্কুলে। মায়ের হেঁসেলে ও সর্বত্র তাঁর গতি ছিল অবাধ। মায়ের ছোটখাট ফাইফরমাস খাটতেন তিনি। স্বামী সারদানন্দজীরও সেবা করার সুযোগ পেয়েছিলেন। মা-ই তাঁকে তাঁর প্রিয় শরতের সেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। জয়রামবাটীতে সারদানন্দজীও অনেক কাজে রামময় মহারাজের ওপর নির্ভর করতেন। জয়রামবাটীতে মায়ের অন্তরঙ্গ লীলার অন্যতম সাক্ষী রামময় মহারাজ।

বদনগঞ্জ উচ্চবিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পাশের পর রামময় মহারাজ বিখ্যাত বাঁকুড়া খ্রিস্টান কলেজে সাম্মানিক ইংরেজি বিভাগে ভর্তি হন। অতি কষ্ট করে তিনি পড়াশোনা করেন। পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁকে বাঁকুড়া শহরে পরিচিত একজনের বাড়িতে গোপালনের কাজ নিতে হয়েছিল। এই কাজের জন্য যে-অর্থ পেতেন, তা দিয়ে তিনি কলেজের পড়াশোনা করতেন। তিনি যখন কলেজের পড়া শেষ করতে যাচ্ছেন, সেসময় খবর পেলেন শ্রীশ্রীমা উদ্বোধনে অসুস্থ। মায়ের বহু সন্তান তাঁকে দর্শন করে যাচ্ছেন। আক্ষেপ করে মা অন্তর্ধানের কিছুকাল আগে বলেছিলেন, ''সবাই এল, কিন্তু আমার রামময় এল না।'' এই সংবাদ যখন রামময় মহারাজের কর্ণগোচর হল, তিনি সোজা উদ্বোধনে চলে এলেন। কিন্তু মা তখন ইহজগৎ ছেড়ে চলে গেছেন। এই শোকাঘাত রামময় মহারাজকে অত্যন্ত পীড়িত করে তুলল। মনে এল বৈরাগ্য, সেইসঙ্গে দেশাত্মবোধ। তিনি অসহযোগ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। কিন্তু তিনি অন্তরে মায়ের ডাক শুনতে পেলেন—"বাছা, আয় আমার কাজে।" তারপরেই তিনি মায়ের ডাকে মায়ের সেবায় যোগ দিলেন রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে। তাঁর অপূর্ব মা-ময় জীবনের অবসান হলে তাঁর অন্তিম কাজ হয় বেলুড় মঠে মায়ের মন্দিরের সামনে মায়ের ঘাটে। শতশত সাধু-ব্রহ্মচারী-ভক্তের চোখের জলে গঙ্গাতীরে রামময় মহারাজের

রামময় মহারাজ [৮৫]

পার্থিব দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হল। আমাদের সামনে তিনি রেখে গেলেন শরণাগতির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীশ্রীমায়ের দুই শিষ্য সেবকের পুণ্যসঙ্গলাভ দর্শন করে আমার জীবন ধন্য।

স্বামী আত্মস্থানন্দজীর মহাসমাধির পর তাঁর জিনিসপত্রের মধ্যে কয়েকটা ফাইল পেয়েছিলাম। লকডাউনের সময় খুলে দেখি একটি প্যাকেটের মধ্যে শ্রীশ্রীমাকে লেখা কয়েকজন ভক্ত ও সাধুর কয়েকটি চিঠি। তার মধ্যে একটি চিঠি স্বামী পরমেশ্বরানন্দজী ব্রহ্মচারী বরদাকে লিখেছেন, আর একটি চিঠি বরদা মহারাজ পরমেশ্বরানন্দজীকে লিখেছেন।

এক

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ শরণং

কলিকাতা

২রা কার্ত্তিক ১৩২৯

শ্রীমান বরদা

তোমার ১লা তারিখের পত্র পাইয়া আশ্বস্ত হইলাম। শরৎ মহারাজ ডাক্তার কাঞ্জিলালকে পাঠাইতে আবশ্যক বিবেচনা হইলে নিজেও যাইতে প্রস্তুত হইতে ছিলেন। যাহা হউক শ্রীশ্রীঠাকুরের কৃপায় পরমারাধ্যা শ্রীশ্রীমায়ের কুশল পাইয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তোমরা শ্রীশ্রীমার পথ্যাপথ্যের দিকে একটু বিশেষ লক্ষ রাখিবে এবং যামিনী প্রভৃতি স্ত্রীলোক ভক্তদিগকে একটু সতর্ক করিয়া দিবে। জল গরম করিয়া ব্যবহার হইতেছে তো? কালকার পত্রে অন্যান্য বিষয় অবগত হইবে। শ্রীমতী রাধারাণী ও শ্রীশ্রীমান মন্মথ প্রভৃতির কুশল পাইয়া আমরা সুখি হইলাম। জগদ্ধাত্রী দেবীর ডাকের গহনা এখান হইতে যাইবে ও দেবীর প্রতিমায় টাটের মেড়োর এবং কতটুকু পরিমাণ মুকুট লাগিবে দেবীর মাথার মাপ পাঠাইবে।... তারিখের পত্রে যে যাচ্ছে গিয়াছে... সহিত ডাকের গহনা ইত্যাদি যাহা যাহা আবশ্যক হইবে সমূহ লিখিবে। কোনরকম ভুল করিও না। দেবীর সালু কাপড় ইত্যাদি যাহা আবশ্যক হইবে পূজনীয় শরৎমহারাজকে জানাইবে।

আমার সম্বন্ধে যাহা আদেশ করেন—তাহা সত্বর জানাইবে। সেইমত-ব্যবস্থা-করিতে হইবে। এখানকার সমূহ কুশল। শুঃ

শ্রীপরমেশ্বরানন্দ

প্রতিমার টাটের মাঝখানের দালানের ধানি কব্জার মাপ পাঠাইবে।

শ্রীমান জ্যোতিকে ও শ্রীমান ভূদেবকে আমার ভালবাসা দিবে। ডাক্তারবাবুকে আমার ভালবাসা জানাইবে।

প্রাপক :

Brahmachari Barada Prasad
Sri Sri Mathakurani House
Joyrambati Vi, P.O. Deshra, Bankura

[বাগবাজারে পোস্টঅফিসের শীলমোহরের তারিখ ১৯ অক্টোবর ১৯। কোতুলপুর ও দেশড়ার পোস্টঅফিসের তারিখ ২০ অক্টোবর ১৯]

দুই

শ্রীশ্রীগুরুদেব ভরসা

Baghbazar
17.1.21

প্রিয় পরমেশ্বরানন্দজী

আপনার প্রেরিত কাপড়-চাদর শ্রীশ্রীমহারাজ পাইয়াছেন এবং আনন্দিত হইয়াছেন।

আপনি তাঁহার শুভাশীর্ব্বাদ জানিবেন। তাঁহার বুধবার দিন কাশীধামে যাইবার কথা হইয়াছে। ইতি

বরদানন্দ

প্রাপক :

Parameswarananda
Jayrambati, Desra P.O
(Bankura Dt.)

[বাগবাজার পোস্টঅফিসের ছাপের তারিখ ১৭ জানুয়ারি ২১। কোতুলপুর ও দেশড়ার পোস্টঅফিসের তারিখ ১৮ জানুয়ারি ২১] *ক্রমশ*